দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 10 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

লাশ আর দেখবো কতো?

সন্ত্রাস দমনে সমস্যার গভীরে যেতে হবে

আহমেদ সেলিম রেজা

প্রথমে ছাত্র দলকর্মী মির্জা গালিব, জাফরুল্লাহ লিটন তারপর টোকাই খোকন ও সবশেষে ছাত্র লীগকর্মী মি [illegible] ন-একে একে সবাই আজ লাশ হয়ে ফিরে গেছে গ্রামে। বাবা-মায়ের সকল স্বপ্ন সাধ গুঁড়িয়ে দিয়েছে তাদের অকাল মৃত্যু। ভাই-বোনদের আশা-আকাঙ্খার কবর রচনা করেছে নিহতের লাশ। তারপরও আমরা বলতে পারি না—থেমে গেছে সন্ত্রাস। ২৭ অক্টোবর '৯১-এর দুঃখজনক হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়েই ইতি হয়েছে ক্যাম্পাস যুদ্ধ। আমরা দেখছি স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে চলছে লাশের মিছিল। বিএনপি সূত্র বলছে, স্বৈরাচারবিরোধী গণ- অভ্যুত্থানের পর থেকে সারা দেশব্যাপী চলছে বিএনপি নিধনযজ্ঞ। সূত্র মতে বিএনপি, যুব দল ও ছাত্র দলের নেতা-কর্মী পর্যায়ে এ পর্যন্ত তাদেরকে গুনতে হয়েছে শতাধিক লাশ। এত লাশের ভার জাতি আর বহন করতে পারছে না।

আওয়ামীলীগ বলছে 'ক্ষমতাসীন বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর অতীতের স্বৈরাচারের ন্যায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করেই চলেছে। আজ সরকারের ছত্রছায়ায়ই শহীদুল ইসলাম চুন্নু, আসলাম, কনক, মুন্না ও হালিমের হত্যাকারীরা ঘুরে বেড়ায়। সরকারী সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছে ছাত্রনেতা শরীফ, শাহীন, পরাগ, চয়ন মল্লিক, মিজানসহ অনেককে। আমরা আর লাশ দেখতে চাই না।

কেন্দ্রীয় পাঁচ দল বলেছে, সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের যাচাই ও সমর্থন সূচক বক্তব্য সন্ত্রাসকে আরো উৎসাহিত করছে।

জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য দল ও সংগঠন বলছে সন্ত্রাসের জন্য বড় দু'টি দলই মূলতঃ দায়ী। প্রগশ বলছে, সরকারের নতজানু নীতিই সন্ত্রাসের জন্য দায়ী।

সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, শুধুমাত্র প্রশাসন দিয়ে সন্ত্রাস দমন করা যাবে না। রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য ব্যতীত সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব নয়। সংসদে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, বিরোধী দলের নেত্রীর সঙ্গে দেখা করে বলেছি, আসুন সমস্যা চিহ্নত করে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুক্ত বিবৃতি দেই। ওদের অবাঞ্চিত ঘোষণা করি। তারপর যে যেখানে যার বাড়ীতেই থাকুক তাকে ধরা হবে। কিন্তু সে বিবৃতি বিরোধী দল দেয়নি। তথ্যমন্ত্রী সংসদে অভিযোগ করেন যে, বিরোধী দলীয় নেত্রী সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ করছেন। অবশ্য কিভাবে করছেন, সে ব্যাখ্যা তিনি দেননি। তিনি ব্যাখ্যা দিলেও সন্ত্রাস বিরোধী দল নিয়ন্ত্রণ করছে—এটা হয়তো প্রমাণিত হতো না। তবে একথা সত্যি ২৭ অক্টোবরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত সন্ত্রাসী চাঞ্চল্যতায় জাতি নতুন করে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেছে। যা গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য হুমকিস্বরূপ এদিকে, এ ঘটনার দায় সরকারীভাবে বিরোধী দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ওপর চাপানো হয়েছে। এ সম্পর্কে প্রচার মাধ্যমগুলিতে ঢালাও প্রচারণাও দেয়া হয়েছে। কিন্তু কাউকে দায়ী করেই কি সরকার তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারবেন? এ ব্যাপারে সরকার প্রাথমিক কি দায়িত্বটা পালন করেছেন? যাতে জাতি আশ্বস্ত হতে পারে? প্লাটুন প্লাটুন পুলিশ, বিডিআর মোতায়েন করে, কার্ফিউ দিয়ে কি মির্জা গালিব লিটন, খোকন ও মুনিরকে বাচাঁ গেছে? না জীবনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি নিশ্চিত করা গেছে? সরকারের মোতায়েনকৃত পুলিশের সামনে ক্যাম্পাসে রীতিমতো গেরিলা কায়দায় ফাইটিং করে লাশের উপর দিয়ে নির্বিঘ্নে হেঁটে চলে গেল স্বশস্ত্র দুষ্কৃতকারী। কাউকে গ্রেফতার করতে পারলো না পুলিশ। কেন? আবার কারফিউ দিয়ে ঘটা করে হলে তল্লাশী চালানো হলো—উদ্ধার করা হলো ৪টি পাইপগান। অথচ, ক্যাম্পাস যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রের তালিকায় পাইপগানের নাম সর্বনিম্নে। ষ্টেনগান, শর্টগান, মেশিনগান, পিস্তল, রাইফেল ইত্যাকার অস্ত্রগুলো গেলো কোথায়? কোন দিক দিয়ে? পুলিশ করলোটা কি? সন্ত্রাস দমনে পুলিশের ভূমিকা কি? প্রশাসন করলটা কি? পুলিশ প্রশাসন, আমলা, নেত্রী, মন্ত্রী কেউ কি সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত?

তাছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুলিশের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আইনের সীমানা বেঁধে দেয়া আছে তা দিয়ে কি ক্যাম্পাস সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করার মতো ক্ষমতা পুলিশের রয়েছে? যদি না থাকে তাহলে সে ক্ষমতা না দিয়ে পুলিশ মোতায়েনের অর্থ কি? আর যদি থেকে থাকে তাহলে পুলিশের ব্যর্থতার জন্য কি 'পানিসমেন্ট' রাখা হয়েছে বা কোন পুলিশকে কি এ পর্যন্ত এ জন্য দায়ী করা হয়েছে? না কোন বিধান আইনে আদৌ রয়েছে? এ বিষয়গুলিও জাতীয় নেতৃবৃন্দ তথা সংশ্লিষ্ট মহলগুলিকে তলিয়ে দেখতে হবে। তাছাড়া সন্ত্রাস দমনে সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা তথা আমলাদের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমলাদের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। সন্ত্রাসকে উৎসাহিত করতে আমলাদের রাজনীতি কতটা কার্যকর কিংবা সন্ত্রাস প্রতিরোধে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগকে ব্যর্থ করে দিতে কিংবা সন্ত্রাসকারীদেরকে আইনের কাছ থেকে আড়াল করতে তাদের কোন হস্তক্ষেপ কিংবা দুষ্টবুদ্ধি সক্রিয় রয়েছে কি-না তাও একটু খোঁজ খবর করা দরকার। কে জানে সরিষার মধ্যেই হয়তো ভূত লুকিয়ে রয়েছে। জাতিকে যে কে কিভাবে কতটা বিভ্রান্ত করে রেখেছে তার হদিস কি সহসাই খুজেঁ পাওয়া সম্ভব? বিশেষ করে যদি সরকার ও জনগণের মধ্যে কোন দূরত্ব থাকে বা সৃষ্টি করে ফেলা যায় তবে তো সেটা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ গণতান্ত্রিক সরকারের ইনফরমার তো জনগণ। চাকরিজীবী ইনফরমারদের সাথে জনগণের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

সরকারী ইনফরমার তথ্য সংগ্রহ করে সরকারকে দেয় চাকরি রক্ষার জন্য কিংবা অন ডিউটি হিসেবে। আর জনগণ তথ্য সংগ্রহ করে নিজ দায়িত্বে নিজেদের মনোনীত সরকারকে দেশ পরিচালনায় সাফল্যজনকভাবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করতে। তাই গণতান্ত্রিক সরকারের সাথে জনগণের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু কোনভাবে যদি এই সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় [illegible]

সমস্যার সমাধানই আমলাগোষ্ঠীর সহযোগিতা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। একথা সন্ত্রাস নির্মূল করার ক্ষেত্রেও একশ'ভাগ কার্যকর। আমরা বিষয়টি বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার, জাতীয়তাবাদীদল ও সন্ত্রাসবিরোধী সকল দল ও [illegible] দেখতে বলবো এবং প্রস্তাব করবো, গণতান্ত্রিক একটি প্রটোকল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার। স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের প্রটোকল আমলা-নিয়ন্ত্রিত। গণতান্ত্রিক সরকারের রীতিনীতিতে এ ধারা অপরিবর্তিত থাকলে গণতান্ত্রিক সরকারের চরিত্র ও স্বৈরাচারী সরকারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা যাবে না। একই প্রেক্ষিতে সন্ত্রাস দমন ও প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও স্বৈরাচারী সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও ফর্মূলা এবং গণতান্ত্রিক সরকারের কর্মসূচী ও ফর্মুলার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা প্রয়োজন ছিল; কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজো সে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়নি। একই প্রক্রিয়ায় আবর্তিত হচ্ছে রাজনীতি, প্রটোকল, সন্ত্রাস ও আমলাতন্ত্র। আর এখানেই গণতন্ত্রের সকল সাফল্য [illegible]